ষষ্ঠ অধ্যায়

বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতায় মিথ ও প্রত্নপ্রতিমা (আর্কিটাইপ)

মিথ (MYTH) কথার অর্থ হল পুরাণ। পুরাণ হল পুরাকথা, পুরাণ প্রাচীন কাহিনী। আদিম মিথ থেকেই গড়ে উঠেছে গ্রীক মিথোলজি এবং আমাদের পুরাণবৃত্ত। তখন কিছু কাহিনী মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল। আদিমকাল থেকে তা বিবর্তিত হয়ে মানব সমাজে চলে আসছে। মিথের মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিক অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া না গেলেও ঐ জাতির নিজের ঐতিহ্যের যে পরিকাঠামো তা মিশে থাকে। পরবর্তীকালে এর উপরেই গড়ে ওঠে সাহিত্যের ইমারত।

ভারতীয় পুরাণের বিষয় পাঁচটি — সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, সর্গে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কাহিনীর আলোচনা, প্রতিসর্গে সৃষ্ট থেকে প্রলয় পরবর্তী সৃষ্টিকাহিনীর আলোচনা থাকে। বংশে থাকে ঋষি ও দেবতাদের বংশবৃত্তান্ত, মন্বন্তরে — মানবজাতির সৃষ্টি, প্রথম সৃষ্ট মানবজাতির কাহিনী এবং মনুর শাসনকালের কথা থাকে আর বংশানুচরিতে — রাজবংশের ইতিহাসের আলোচনা থাকে। পুরাণে প্রাধান্য দেওয়া হয় ধর্মীয় এবং দার্শনিক চিন্তা ও নির্দিষ্ট কোনো দেবতাকে।

মিথের আদিরূপের মধ্যে উপস্থিত ধর্মাচার, দেবতার কল্পনা, নানাধরনের সংস্কার, ইতিহাস, আখ্যান ইত্যাদি। পরে কবি-শিল্পী এই উপকরণগুলি নিয়ে সমকালীন জীবনধারার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সৃষ্টি করেন নব নব কাহিনী।

আদিমকাল থেকেই কোনো বাস্তব ঘটনার উপর অথবা বাস্তব জগতের ব্যক্তির উপর অনেক সময় মানুষ যে কথা আরোপ করেন সেই আরোপিত কথাগুলিই পরে পরিণত হয় 'মিথ'-এ। তাই মিথকে বলা হয় পৌরাণিক কাহিনী, পুরাণকথা, লোকপুরাণ, লিজেন্ড, লোককথা।

লোককথা বা পুরাণকথার উৎস আর্কিটাইপ[১]। আর্কিটাইপ কথার অর্থ 'প্রত্নপ্রতিমা'। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান'-এ কবি বীতশোক ভট্টাচার্য আর্কিটাইপ সম্বন্ধে বলেন:

"আরকিটাইপ বস্তুর এমন এক শ্রেণীগতভাব যাতে সেই শ্রেণীর প্রতিটি প্রতিনিধির আলাদা আলাদাভাবে যা মূল চরিত্রগত উপাদান সেগুলিও ধরা পড়ে। আরকিটাইপ খুব বেশি বিমূর্ত

এক শ্রেণীগত আদর্শের নাম।" [২]

চর্যাগানে কায়াতরুর কথা বলা হয়েছে। এই তরু চর্যাগানের আর্কিটাইপ। আর্কিটাইপ হতে পারে কোনো 'ভাব, চরিত্র, ঘটনাসূত্র বা পরিবেশ'। তবে এর মূল চারিত্র হবে আদিম, সাধারণ ও সার্বিক। আর্কিটাইপের প্রধান প্রসঙ্গ 'জন্ম, উপনয়ন, পাপ, প্রায়শ্চিত্ত ও মৃত্যু'। বাস্তব এবং কল্পনার দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি ও সমাজের লড়াই, নিয়তি এবং মুক্তবুদ্ধির লড়াই আরকিটাইপের থিম। পিতা ও মাতার সম্পর্ক, মাতা সন্তানের সম্পর্ক, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের 'উভযোজ্যতা' — এগুলিকে বলা হয় আরকিটাইপগত পরিস্থিতি। 'মানবজীবনের প্রধান ঘটনা – জন্ম, বিকাশ, প্রেম, পারিবারিক জীবন, জ্বরা, মৃত্যু' – প্রভৃতি সকল ঘটনাই আর্কিটাইপ। বিভিন্ন সাহিত্যিক রীতি – ট্র্যাজেডি, কমেডি, রোমান্স, এপিক, লিরিক ইত্যাদি ও আর্কিটাইপের মর্যাদা পেয়েছে। মর্যাদা পেয়েছে ক্লাউন, হিরো, ভিলেন, বিপন্নানারী প্রভৃতি চরিত্র, প্রেম, বীরত্ব, শোক, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি থিম।[৩]

আর্কিটাইপ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন সেন্ট অগস্টিন, প্লেটো, ইয়ুং, ফ্রেজার, ফ্রয়েড প্রমুখ। সেন্ট অগস্টিন তাঁর 'কনফেশনস্'-এ আর্কিটাইপ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁর মতে: অতীতকালের মানুষের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি আর্কিটাইপ রূপে বর্তমানকালের মানুষের মনে জেগে ওঠে। আর তা সম্ভব হয় মানুষের অন্তর্জগতে থাকা যৌথ নির্জ্ঞাত স্তরের জন্য। যেখানে আশ্রয় নেয় প্রত্নপ্রতিমা। [৪]

শঙ্কর বসুমল্লিক ও গৌরী ভট্টাচার্য্যর 'পুরাকথার স্বরূপ'বইয়ে উল্লেখ আছে — ক্লদ লেভি স্ট্রাউস, মির্চা এলিয়েড প্রমুখর। 'পুরাকথার স্বরূপ'-এ পুরাকথা নিয়ে আলোচনা আছে ক্লদ লেভি স্ট্রাউস, মির্চা এলিয়েড, প্লেটো প্রমুখের। প্লেটোর মতে সত্য, শিব ও সুন্দরই আর্কিটাইপাল বা আদর্শ প্রতীতি।[৫] ইয়ুং এর মতে (Fordham, Frieda; 'An Introduction to Jung's Psychology', Penguin). প্রত্যেক মানুষের মনের নির্জ্ঞাত স্তরে সঞ্চিত থাকে মানব প্রজাতির সমস্ত অভিজ্ঞতা এবং তা থাকে প্রত্নপ্রতিমারূপে, মিথ রূপে।[৬]

বাংলা আধুনিক কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় পুরাণ প্রসঙ্গের নতুন ধারার প্রবর্তন। মিথকে ভাঙা হয়, তার মধ্যে নতুন চেহারা দেওয়া হয়। পৌরাণিক চরিত্র ও পৌরাণিক প্রসঙ্গ বিভিন্ন কবির কবিতায় নানা মাত্রা পায়। আধুনিক বাংলা কবিতায় পুরাণ চেতনা আসে নানারকম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কখনো কবির বক্তব্যকে আরো বেশি করে হৃদয়গ্রাহী ও স্পষ্ট করে

তুলতে, কখনো বা 'প্রতীকী অর্থকে প্রকাশ করতে', 'কোনো ভাবের বাহন হিসেবে', আবার 'পুরাণের নবনির্মাণ বা বিনির্মাণের' জন্য। পুরাণ কাহিনী দু'রকমের হতে পারে —

ক) স্বীকৃত পৌরাণিক মহাকাব্য কাহিনীর পুরাণ: 'অসম্ভব দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ি'।[৭] ('দ্রৌপদীর শাড়ি' / বুদ্ধদেব বসু)

এখানে কবি মহাভারতের প্রসঙ্গকে এনেছেন অন্যভাবে।

খ) লোকপুরাণ :

'একদিন ভোরবেলা ক্রমশ হয়েছে মনে ঘন্টাধ্বনি শুনে

কাছে কোন গ্রাম আছে; . . .' [৮]('একদিন ভোরবেলা' / বীতশোক ভট্টাচার্য)

ঘন্টাধ্বনির অলৌকিক টানের সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের সম্বন্ধকে লোকপুরাণ বলা যায়।

পুরাণ চেতনা, পুরাণ অনুষঙ্গ কবিদের কবিতায় বারবার এসেছে। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যও কাব্যের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন পুরাণ কথা বা প্রত্নপ্রতিমাকে, তবে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। মিথ বা পুরাণ, আর্কিটাইপ বা প্রত্নপ্রতিমাকে কবিতার বিচারের জন্য কাব্যের উপকরণ হিসেবে পৃথক করা দুরূহ, কারণ কবিগণ তাঁদের কবিতায় মিথের ব্যবহার করেন কখনো 'প্রত্নপ্রতিমারূপী প্রতীক' হিসেবে, কখনও রূপক হিসেবে, কখনওবা কাহিনী হিসেবে।

'জলের তিলক' কাব্যগ্রন্থের 'শেষের কবিতা' নামক কবিতাটিতে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য আর্কিটাইপ - মিথের ব্যবহার দেখিয়েছেন একত্রে:

'একটি বই। আরও একটি। একটির পর, একটি।

খাড়া শিরদাঁড়া, সার দেওয়া বইয়ের থাক। কে

আবিষ্কার করল বইয়ের তাক ? পাঠাগার কার আবিষ্কার ?

কাঠ থেকে কাগজ, কাঠ থেকে দরজা জানালা বইয়ের আলমারি।

কাঠবেড়ালি কিছু জানে না। দারুণ সব প্রশ্ন। কাঠবেড়ালি

ভাঙা আখরোটের দানা মুখে নিয়ে গাছে ওঠে, গাছ থেকে

নেমে আসে। দারুণ সব প্রশ্ন। লাবণ্যও কিছু জানে না।

পাতা-খোলা বলাকা-য় সকালের ওম, শিশিরের ভেজা, হাওয়া

লুকোচুরি খেলে। ছায়া পড়ে অমিত রায়ের। পেছনে

নিবারণ চক্রবর্তীর ছায়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছায়া আরও পিছনে।

রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত খণ্ড প্রকাশ হয়। প্রকাশ পায়

প্রতিযোগিতায় সুন্দরী, সোঁদামাটির সেন্ট, সাগরশীকর লিপ্ত

বাতাসের সুগন্ধ, আর, শেষের কবিতা, থাকে। আরও আতিথ্য থাকে

প্রেমের, আলোর।[৯]

('শেষের কবিতা' , 'জলের তিলক')

কবিতাটি শুরু বই দিয়ে:

'একটি বই, আরও একটি, একটির পর, একটি।

খাড়া শিরদাঁড়া, সার-দেওয়া বইয়ের থাক।'

'শেষের কবিতা' একটি বই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উপন্যাস। একটির পর একটি বই থাক করে রাখা হয় বইয়ের তাকে। বইয়ের থাক শিরদাঁড়ার মত সোজা। যে দেখছে তারও সোজা শিরদাঁড়া। শিরদাঁড়াকে অবশ্যই সোজা হতে হয়, আর তার জন্য প্রয়োজন বই পড়ার। এ দিক দিয়ে সম্মানীয় কালীদাস, সম্মানীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' বইটি শোভা পায় পাঠাগারের আলমারিতে। তাই বইয়ের 'তাক' পাঠাগারের আবিষ্কর্তা কে তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। বই না পড়লে হয়তো এ প্রশ্ন জাগত না। বই পড়লেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসে হাজির হয়। বইয়ের 'থাক' আর বইয়ের 'তাক' — 'থাকে'র সঙ্গে 'তাকে'র অদ্ভুত মিল। বই রাখা হয় তাকে, আর তা রাখা হয় থাক করে।

কাঠ থেকে তৈরী হয় কাগজ। কাঠ থেকে হয় দরজা, জানালা, কাঠ থেকে হয় বইয়ের আলমারি। আবার কাঠ শব্দটির অনুষঙ্গে যুক্ত হয়ে আসে কাঠবেড়ালি শব্দটি। তবে কাঠ আর কাঠবেড়ালি কাছাকাছি থাকলেও এসব তথ্য কাঠবেড়ালী জানে না। সে জানে না কাগজ ও আলমারির জন্ম রহস্য। পেয়ারা খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দিতে পারে না কাঠবেড়ালি। সহজ, সরল তার জীবনযাপন।

বীতশোক ভট্টাচার্যের 'শেষের কবিতা'র আর্কিটাইপ বা আদিরূপ কাঠ, কাঠ থেকে তৈরী কাগজ, কাগজ থেকে বই, কাঠ থেকে আলমারি, দরজা, জানালা এগুলি শিল্প। মানবরচিত

শিল্প। এ শিল্পে মানুষের প্রয়োজনও স্থাপিত।

কবির 'শেষের কবিতা'য় আখরোটের দানার কথা আছে। ভাঙা আখরোটের দানা মুখে নিয়ে কাঠবেড়ালি গাছে ওঠে কোনো ভয় না করে। আবার গাছ থেকে নেমেও আসে। এখানে কাঠবেড়ালির সঙ্গে লাবণ্যের এক অদ্ভুত মিল আছে। কাঠবেড়ালিও কিছু জানে না। লাবণ্যও কিছু জানে না, বন্ধুত্বও আছে উভয়ের মধ্যে। লাবণ্য কাঠবেড়ালির জন্য আখরোটের দানা আনতে ভোলে নি। কাঠবেড়ালির দিকে আখরোট ছুঁড়ে দেয় সচেতনভাবেই। 'লাবণ্য' শব্দটি দুটি অর্থ বহন করে। লাবণ্য অর্থাৎ লবনত্ব, লবন ভাব। লাবণ্য মানে দেহ কান্তি। কবির কবিতায় কাঠবেড়ালির লাবণ্য, গাছের লাবণ্য, লাবণ্যর লাবণ্যের কথা লক্ষ্য করা যায়। কাঠবেড়ালির মতই লাবণ্য কিছু জানে না। অমিত রায়ের কোনো প্রশ্নের উত্তরই লাবণ্যের জানা নেই।

'পাতা খোলা বলাকায় সকালের ওম' — বলাকা হল বক। 'বলাকা' হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ। দুটি পাখা খুলে নিজেকে সঞ্চালিত করে বক। আবার পাতা-খোলা বই বলাকা। 'বলাকা'য় সকালের ওম' — 'ওম' শব্দটি বেদের (ঋক্‌বেদ) চিরন্তন বীজস্বরূপ। ওম্ ব্রহ্মাস্বরূপ। অস্তিত্বের সৃষ্টি, পালন, বিনাশের বৃত্তি সম্পূর্ণ করে ওম্ একটি পবিত্র শব্দ হয়ে দাঁড়ায় সকালে। সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা, পালনের দেবতা বিষ্ণু, বিনাশের দেবতা মহেশ্বর ওম্ শব্দটির মধ্যে জাগ্রত। বিশ্বরহস্যের উপলব্ধি ও উচ্চারণ মন্ত্রের রূপ নিয়েছে। সবার জন্যই এই গায়ত্রী মন্ত্র। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় পবিত্রভাবে গায়ত্রী মন্ত্র গেয়ে অথবা পাঠ করে বা আবৃত্তি করে মানুষ ত্রাণ প্রার্থনা করে। এই মন্ত্র নিবেদিত হয় সূর্যের উদ্দেশ্যে। সূর্য দেবীরূপিনী সবিতা, 'ব্রহ্মার স্ত্রী এবং চতুর্বেদের মা। বলাকা'র পাতায় লুকোচুরি খেলে সকালের রোদ্দুর, শিশির ভেজা হাওয়া। 'লুকোচুরি খেলা' মানুষের বহুত্ববোধকে ইঙ্গিত করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অনেক বোধ কাজ করে।

'ছায়া পড়ে অমিতরায়ের
পেছনে নিবারণ চক্রবর্তীর ছায়া
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছায়া আরও পিছনে।'

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর নিজস্ব কবি ভাষায় প্রকাশ করেছেন এ তথ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নিবারণ চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্য নাম। নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতা মুখে মুখে বলে যায় অমিত রায়। অমিত রায় একজন ব্যক্তি। আবার 'অমিত'

বলতে বোঝায় নয় মিত অর্থাৎ মিত্র নয়, অল্প নয়, সংযত নয়। অমিত রায়ের ছায়া পড়েছে পেছনে নিবারণ চক্রবর্তীর ওপর, নিবারণ চক্রবর্তীর ছায়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর। 'ছায়া' আদিরূপের কাজ করেছে।

'শেষের কবিতা' উপন্যাসে লাবণ্যের কাছে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিল কেটি মিত্র, ঠিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলিত খণ্ডের'[১০] হঠাৎ প্রকাশের মতো।

সুন্দরীদের প্রতিযোগিতায় লাবণ্যের অনুপস্থিতি আমাদের জানিয়ে দেয় লাবণ্য যে পরিবেশে বড় হয়েছে সেখানে সোঁদামাটির গন্ধ নেই, সাগরের জলকণা লিপ্ত বাতাসের সুগন্ধ নেই। আছে শুধুই নির্মল প্রকৃতি, মাটির নির্ভেজাল গন্ধ। তবু শেষের কবিতা থাকে। কারণ শেষের কবিতা প্রেমেরই নামান্তর। এ প্রেম চিরন্তন। 'প্রেম', 'সোঁদামাটির গন্ধ', 'সাগরের জলকণা' বাতাসের সুগন্ধ এগুলো নিয়েই রচিত হয় কবিতা।

'আতিথ্য থাকে প্রেমের, আলোর'

কবিতার মধ্যে আতিথ্য থাকে প্রেমের, আলোর। আলো অন্ধকার দূর করে, আলো মানুষের মনের কুসংস্কার দূর করে। এখানে আলো মানে প্রজ্ঞা।

কবিতাটিতে পুরাণ, আর্কিটাইপের প্রসঙ্গ উপস্থিত। বৈদিক ওম্ স্মরণ করিয়ে দেয় পুরাণের, আর কাঠ, ছায়া আর্কিটাইপ বা আদিরূপ। আদিরূপ কাঠের বিশ্লেষণ করেছেন কবি তাঁর কবিতায়।

এইরকম পুনর্নির্মাণ কবির অন্য আর একটি কবিতায় :

'একদিন ভোরবেলা ক্রমশ হয়েছে মনে ঘন্টাধ্বনি শুনে
কাছে কোনো গ্রাম আছে; অস্তিত্বে প্রার্থনা আছে; এই তো সময়
যে মুহূর্তে জেগে উঠে কিছু ক্ষণকাল ধরে খালি মনে হয়:
হবে, জাগরণ হবে আমাদেরও ধীরে ধীরে; কী নিপুণ এ

প্রত্যাশার পদশব্দ, তোমার পায়ের পদ্ম যেমন বিজন
অভ্যাসের বশবর্তী, কেবলই হৃদয় জল পাদ্য অর্ঘ্যদের
স্নিগ্ধ দূরে ঠেলে রাখে, তেমনই ঘন্টার ধ্বনি শুনে শান্ত টের
পাওয়া যায়... আসবেনা; পড়ে আছে স্তব্ধ রোদ, বালার নিক্কণ[১১]

('একদিন ভোরবেলা' , 'অন্যযুগের সখা')

পুরাণ কথা বা প্রত্নপ্রতিমার ব্যবহার দেখা যায় একদিন ভোরবেলা কবিতাতেও। গ্রাম, ভোরবেলাকার ঘন্টাধ্বনি এখানে প্রত্নপ্রতিমা। গ্রামের মানুষের সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনির সম্পর্ক সর্বকালের। এই সম্বন্ধকে বলা হয় লোকপুরাণ। ভোরের ঘণ্টার ধ্বনি শুনে গ্রামের মানুষ জেগে ওঠে। সামনেই কোনো গ্রামের উপস্থিতির কথা ভাবনায় আসে। ঘণ্টাধ্বনির অস্তিত্বে আছে প্রার্থনা:

'.... ক্রমশ হয়েছে মনে ঘণ্টাধ্বনি শুনে
কাছে কোনো গ্রাম আছে; অস্তিত্বে প্রার্থনা আছে; ...'

ঘণ্টাধ্বনি, প্রার্থনা ইঙ্গিত দেয় কোনো দেবালয়ের। এই ধ্বনি শুনে মানুষ নতুনভাবে বাস্তব জগতের শূণ্যতা, ব্যর্থতার মধ্যেও জেগে উঠতে চেষ্টা করে।

মানুষের মনে জাগ্রত হয় প্রত্যাশা। ঘণ্টাধ্বনির শব্দ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হয় প্রত্যাশার পদশব্দে। প্রত্যাশাগুলো আসে নীরবে, জনহীন অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে। ঘণ্টার ধ্বনি আকৃষ্ট করে গ্রামীণ মানুষকে। শহরের মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি নেই। ঘণ্টাধ্বনি শুনে শহুরে মানুষের মধ্যে অদ্ভুত টান জন্মায় না। 'বালার ঝঙ্কার', 'স্তব্ধ রোদ' পড়ে থাকে। এই ধ্বনি না আসার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। কবিতাটি লোকপুরাণ প্রত্নপ্রতিমা হয়ে এগিয়ে গেছে মানুষের সমস্ত বাধা বিপত্তি এড়িয়ে নতুন করে জেগে ওঠার দিকে।

পুরাণ কবির কবিতায় অনায়াসে স্থান করে নেয়, কবির কলমে কবিতার পুনর্নির্মাণ ঘটে। ফলে তাঁর কবিতা নতুন ধরনের মাত্রা পায়। নিত্য নতুন হয়ে ওঠে পুরাণ। এ প্রসঙ্গে স্মরণে আসে 'যাত্রা' কবিতাটি:

'আমরা ফিরে এসেছি রামলীলার ময়দান থেকে,
রাবণ পোড়া দেখে ফিরেছি আমরা।
এক্কাচালকের গলায় শীতের রাতে
শুনেছি তুলসীদাসের ভজনের সুর;
মাঠের বাঁশির মতো তার গলা,
মাঠের ভিতর যেন একটাই বাড়ি
সারানো যায় না ঘর দোরের মুখ,
বেমেরামত কলকব্জা।

আমার মাথা থেকে সরে গিয়েছে ওর হাত,
রামের হাত ধরে আছে সীতার মাথায় তালপাতা।
রোদ থেকে ছায়ায় ফিরেছি আমরা,
ছায়া থেকে শীত রাতের দিকে।
কারা ভিড় করে এসেছে চারপাইয়ের চারপাশে,
দশদিকে ছড়িয়ে আছে তারার আলো,
শোনা গেল মেঘ আর পাখার আলোড়ন।
হাঁসফাঁস ধুলো আর গরমের ভিতর থেকে
আমরা নিয়ে এসেছি সীতারামের পট।
বছরের পর বছর
আমরা বসে আছি মহাবীরের জন্য,
মহাবীরের মতো মেঘ, মহাবীরের মতো হাওয়া;
আমরা বসে আছি মহাবীরের জন্য
বালিয়াড়িতে বসে আছি, বনের ভিতর, তারার আলোর নিচে।
পাল নড়ে উঠেছে একবার,
একবার হাল বসে গিয়েছে মাটির গভীরে
উঠে এসেছে দুঃখের বীজ
আমাদের মেয়ের নাম দেওয়া হয়নি এখনও।[১২]

('যাত্রা', 'নতুন কবিতা')

রামলীলার ময়দান থেকে রাবণপোড়া দেখে ফিরে এসেছে এক্কাচালকের গাড়ি। চালকের গলা থেকে যে সুর বেরিয়ে আসে তা তুলসীদাসের ভজনের। এখানে 'এক্কাচালক' পরিশ্রমকারী মেহনতী মানুষ। মেহনতী মানুষ 'বেসুরে গায় তুলসীদাসের ভজন'।[১৩]এক্কাচালকই কবিতার কথক। শীতের রাতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার কথা সে বলেছে। কথক এবং তার স্ত্রী কিনে নিয়ে এসেছে সীতারামের পট। যা এ কবিতায় প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগকে স্পর্শ করে বর্তমান সমাজে উঠে আসে। পটের ছবিতে আছে রামের হাত সীতার মাথায় তালপাতা ধরে আছে। অথচ বাস্তবের চিত্র উল্টো, সেখানে —

'আমার মাথা থেকে সরে গিয়েছে ওর হাত'।

এ সমাজের মানুষ কন্যা সন্তান জন্ম নিলে দুঃখ পায়। রামায়ণ কথা, তুলসী দাশের ভজন তাদের মনের পরিবর্তন আনতে পারে না। এক্কাগাড়ীতে যাওয়ার সময় চালক এইভাবে তার জীবনের কিছু কথা তুলে ধরে। কবিতায় 'আমরা' অর্থাৎ আধুনিক মানুষগুলির সমাজ এবং সংস্কৃতির কথাও কবি বলেছেন। 'ভারতীয় তথা বাঙালী জীবনে আধুনিক সময়েও মানুষকে ভাবতে হয় মেয়ের নাম সীতা রাখবে কিনা, কারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ভাবে সীতা নামধারী মেয়েরাই দুঃখে জীবন কাটায়। তাই মানুষ চায় মহাবীর, দুরন্ত শিশু, হনুমান। চায় 'মহাবীরের মতো মেঘ, মহাবীরের মতো হাওয়া'।

কবিতার শেষে আছে মাটির গভীরে বসে গেছে হাল —

'উঠে এসেছে দুঃখের বীজ
আমাদের মেয়ের নাম দেওয়া হয়নি এখনও।'

এখানে রামায়ণ প্রসঙ্গ উপস্থিত। আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারি মাটি থেকে উঠে আসা মেয়েটিই সীতা, পুরাণের 'দুঃখিনী কন্যা' সীতা। জন্ম থেকেই দুঃখিনী। সীতাই দুঃখের বীজ। এই আধুনিক সময়েও মেয়েরা অবাঞ্ছিত। তাই মেয়ের নাম রাখা হয়নি। আমরা দেখি রামের যে হাত সীতার মাথায় তালপাতা ধরে রেখেছিল সে হাত সরে গেছে তার মাথা থেকে। কবিতাটি এগিয়ে গেছে রোদ থেকে ছায়ার দিকে, ছায়া থেকে শীতরাতের দিকে আবার শীত থেকে ছায়া, ছায়া থেকে রোদের দিকে। এ যাত্রার সঙ্গে যুক্ত আমি, আমরা, মহাবীর, সীতা, রাম, এক্কাচালক, রামলীলার ময়দান, আবহমান চিরপ্রচলিত সংস্কৃতি এবং কবির অর্ন্তসংস্কৃতি। এই অর্ন্তসংস্কৃতি পরস্পর বিরোধী কতকগুলি ছবিকে পাশাপাশি রেখেছে। কবিতাটিতে পাঠকের রামকথা শোনা, রামলীলার ময়দানে রাবণের পোড়া দেখে প্রাচীন ও বর্তমানের মিলন অনুভব করার ইঙ্গিত স্পষ্ট। ঘরে ফিরে দেখে মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য তার নাম রাখা হয়নি এ সময়েও।

রামায়ণে আছে জনক সীতাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন লাঙল চালিয়ে মাটি কর্ষণের সময়। এই কবিতাতেও আছে মাটির গভীরে হাল বসে যাওয়ার মধ্যে সীতাকে কুড়িয়ে পাওয়ার প্রসঙ্গ। যা হাজার বছরের পুরানো রামায়ণের কথাকে স্মরণ করায়। 'রামলীলার ময়দান', 'রাবণপোড়া', 'মহাবীর', 'সীতা', রাম, সীতারামের পটের চিত্র কবিতাটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। কবিতার যাত্রা পুরাণ কথা থেকে ভারতীয় জীবনে। কবিতাটিকে আরও নতুনভাবে প্রতিস্থাপিত করেছেন বাঙালী জীবনের সমাজ এবং সংস্কারের মধ্যে।

'দ্বিরাগমন' কাব্যের 'পদাবলি' কবিতাতেও পুরাণকথার পুনর্নির্মাণ করেছেন কবি:

'তুমি কে ? বলেছে রাধা। আর কোনও পায়নি উত্তর।
ঘন কালো মেঘ নাকি: কিছু নেই এরও জবাব।
যেন জানে সইদের সবই বলা রাধার স্বভাব।
রাধা কি অলকমেঘ — ঘন কালো মেঘের ভেতর।

কৃষ্ণ তা জানে না। বর্ষা। ঘাসে জলে ঢেকে যায় পথ।
পাঠরত পুরোহিত, আসলে সে গলাতোলা ব্যাঙ।
রাজার কুমার ও কি, ছদ্মবেশে করে যোগ ধ্যান:
রাধা শোনে, আর ভাবে। ভাবনায় শেষ এইপদ[১৪] ('পদাবলি' , 'দ্বিরাগমন')

আট চরণে রচিত 'পদাবলি' কবিতাটি বৈষ্ণব পদাবলি অবলম্বনে লেখা। রাধাকৃষ্ণের পুরাণ কথা কবিতার বিষয়। রাধা এখানে অভিসারিণী। আকুল আগ্রহে জানতে চেয়েছে রাধা কৃষ্ণের পরিচয়। কিন্তু কোনো উত্তরই পায়নি। 'ঘন কালো মেঘ'রূপী কৃষ্ণ দেয়নি কোনো জবাব। স্বভাববশত রাধা তার সখীদের কাছে কৃষ্ণ সম্পর্কে সব কথা বলেছে। এখানে কবি অভিসারিণী রাধাকে ঘন কালো মেঘরূপী কৃষ্ণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন স্থায়ী আসনে। পদাবলির রাধা এখানে হয়ে উঠেছে বাস্তবের রাধা। সমস্ত কিছু জানার কৌতূহল তার একটু বেশিই। স্বাভাবিক মেয়ের মতই রাধা জানতে চেয়েছে প্রিয়জনের পরিচয়, বিশেষিত করেছে, চমৎকার বিশেষণে:

'ঘন কালো মেঘ নাকি...।'

দ্বিতীয় স্তবকে পাই কৃষ্ণের অজানার কথা। কৃষ্ণ কিছুই জানে না। বর্ষাতে ঘাস, পথ-ঘাট-জল ঢেকে যায়। তার মধ্য দিয়েই চলেছে রাধার অভিসার। কোন অনুশাসন, কোনো বাধা না মেনেই রাধার এ অভিসার কৃষ্ণের উদ্দেশে। বর্ষা-শব্দটি এসেছে অভিসার ভাবনার অনুষঙ্গে। আর ব্যাঙ শব্দটি এসেছে বর্ষার অনুষঙ্গে। বর্ষার সঙ্গে ব্যাঙের সম্বন্ধ গভীর – জল আর জীবন, জীবন আর প্রেম। পুরোহিত পাঠ করছেন রাধাকৃষ্ণের অমর প্রেম কাহিনী। পুরোহিতকে তিনি তুলনা করেছেন 'গলাতোলা ব্যাঙের' সঙ্গে। বর্ষার ছোঁয়ায় ব্যাঙ নির্দিষ্ট স্থানে স্থির হয়ে বসে ডাক পাড়ে গলা তুলে। একইভাবে, পুরোহিতও তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসে পদাবলি পাঠ করেন গলা তুলে অর্থাৎ উচ্চস্বরে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা শুনে ভাবনায় বিভোর হয়ে উঠেছে শ্রোতা।

ছদ্মবেশে যোগধ্যানকারীকে রাধার মনে হয়েছে 'রাজার কুমার':

'রাজার কুমার ও কি, ছদ্মবেশে করে যোগধ্যান:
রাধা শোনে, আর ভাবে।'

সাধারণ পুরুষের মতোই কৃষ্ণ হয়ে উঠেছে 'রাজার কুমার', হয়ে উঠেছে ছদ্মবেশী যোগী, ধ্যানী। অভিসারিণী রাধা ধ্যানী কৃষ্ণকে দেখে বিস্মিত হয়, ভাবতে থাকে। অভিসার এককভাবে হয় না। নায়ক-নায়িকার সম্মিলিত মনোভাব অভিসারে কাজ করে। নায়িকার বা নায়কের মন থেকে ভাবাবেগ হঠাৎ করে দূরে সরে গেলে অভিসার হয় না। এখানে কৃষ্ণ ছদ্মবেশী হয়ে যাওয়াতে রাধার মনে ভাবনার সঞ্চার হয়, ছদ্মবেশ যদি সত্য হয়ে ওঠে। বাস্তব নর-নারীকেও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে নিতে হয় ছদ্মবেশ, তখন ভাবাবেগ থাকে স্তব্ধ। যোগী বা ধ্যানী হয়ে অপেক্ষা করতে হয় আগামী শুভ দিনের। সুতরাং এ কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা আর বৈষ্ণব পদাবলীতে সীমাবদ্ধ থাকছে না। বিশ্বজগতের মানব-মানবীর প্রেম কাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পুরাণ কথা হয়ে উঠেছে বাস্তব কথা।

মিথ নিয়ে কবিতা লিখেছেন কবি অমিতাভ গুপ্ত। কিন্তু তাঁর পুরাণ কথার পুনর্নির্মাণ সরাসরি চোখে আঙুল দিয়ে বর্তমান বাস্তবকে প্রস্ফুটিত করে। এখানেই মনে হয় তিনি কবিতাটির মধ্যে উপস্থিত হয়ে নিজস্ব বিশেষ দর্শনকে চারিয়ে দিচ্ছেন কবিতায় :

"আমার সর্বস্ব বলতে পোড়া হাঁড়ি, কানাভাঙা থালা
একপেট খিদে
তাই নিয়ে বসে পড়ি, যেখানে যেমন পারি, যেমন বিধেয়
ভারত গাথায় আমি বিস্ময়চিহ্নের মতো: মাগো, ফ্যান দাও![১৫]

('কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ: কবি' , 'মাতা ও মৃত্তিকা')

নীরবতা ভেঙে, পুরাণ বাস্তব ভেঙে, জ্যোৎস্না ভেঙে শব্দ কথনে জাদু এনেছেন কবি কালীকৃষ্ণ গুহ। পুরাণ ভেঙে তিনি কবিতায় এনেছেন রহস্যমায়ার জীবন। তাঁর কবিতায় উপস্থিত বিষণ্ণতা, রহস্যময়তা, অন্ধকার, রাত্রি, মৃত্যু এবং তুমি-আমির সম্পর্ক বিন্যাস :

কোথায় রয়েছ তুমি ?
রাত্রির ভিতর থেকে মাথা তুলে বারবার এই প্রশ্ন করি।
পূর্ণিমায় রাস্তাঘাট মায়াময় ছিল;

বাড়ি ফিরে এসেছি যখন, রাত্রি ছিল
তৃতীয় প্রহরে।
নীরবতা ভেঙে জ্যোৎস্না ভেঙে পুরাণ বাস্তব ভেঙে
প্রশ্ন করেছি।
প্রশ্নের ভিতরে ভিক্ষা
প্রশ্নের ভিতরে কত ঝরাপাতা আমের মুকুল
দিন কেটে গেছে
কোথাও রয়েছ তুমি নিজস্ব মায়ায়...[১৬]

('রাস্তাঘাট' , 'অপার যে বিস্মরণ')

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য ঠিক এরকম কবিতা লেখেননি। 'অন্যযুগের সখা'র 'দীপান্তর' কবিতা এখানে উদাহরণযোগ্য ঃ

দূরে দূরে ছাতে দীপাবলি জ্বলে ওঠে;
ছাতেরও উপরে জ্বলে উঠেছিল তারা;
তবু, নেমে এসো, অন্ধ, সময়হারা;
কোনো কথা নেই; শুধু কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে
কতদিন আছো, কত কাল ঘরছাড়া !

আর তুমি নিজে কতকাল সংবৃত ?
উঠে আলো জ্বালো, আজ এই নীল রাতে
বাড়ে ব্যবধান, দুটি হাত পোড়েনি তো।
অবিকল এক — আমরণ সংঘাতে
জানু কেঁপে ছোঁয়; দীপাবলি দূর, ছাতে।[১৭] ('দীপান্তর' , 'অন্য যুগের সখা')

'দীপাবলি' এখানে প্রন্নপ্রতিমা। দীপাবলি অর্থাৎ প্রদীপের সমষ্টি। ভারতীয় চেতনায় দীপাবলি ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে আসে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় সমষ্টিগতভাবে। আবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও একইভাবে প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রদীপের আলো অন্ধকার দূর করে। দূর করে অশিক্ষা, কুসংস্কার। সমস্ত বাধা বিপত্তিকে

দূর করে দীপাবলি হয়ে ওঠে শুভ সূচনার প্রতীক।

কালীপুজোর রাতে দীপাবলি জ্বলে ওঠার কথা বলেছেন কবি:

'দূরে দূরে ছাতে দীপাবলি জ্বলে ওঠে।' 'দূরে দূরে ছাতে' প্রদীপগুলো জ্বলে। দূর থেকে প্রদীপগুলির জ্বলা দেখে মনে হয় প্রদীপগুলিতে কোনো ব্যবধান নেই। কিন্তু দীপগুলি যখন সাজানো হয় তখন একটির সঙ্গে অপরটির দূরত্ব বজায় রেখেই কাজটি করা হয়। আমাদের মানবজীবনেও এরকম ব্যবধান তৈরি হয় একজনের সঙ্গে অন্যজনের, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার:

'..., আজ এই নীল রাতে
বাড়ে ব্যবধান,...।

কতসময় নিজেকে আবৃত / সংকুচিত করে রেখেছেন কথা বলেছেন কবি। কবি বীতশোক ভট্টাচার্য এই কবিতাটিতে তাঁর কল্পনাকে বিস্তৃত করেছেন প্রন্নপ্রতিমা দীপাবলির মধ্য দিয়ে। দীপাবলির ব্যবধানকে মানবজীবনের ব্যবধানের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে কবিতাটিকে নিয়ে গেছেন বহুদূরে। যেখানে:

'দীপাবলি দূর, ছাতে।'

পুরাণ এর উল্লেখ আছে 'নতুন কবিতা'র 'এই গান' কবিতাতেও :

এই গানখানি আধখানা নিশি-পাওয়া,
বাকিটুকু আধ-কপালের সন্তান।
এই গানে ছিল তোমার দোহার চাওয়া —
পেয়েছে চামর মন্দিরা সম্মান।

মন্দিরে তবে উঠুক পুরোনো ধুয়ো।
তাল দিতে চাই ইচ্ছুক সঙ্গতে;
আধখানা গান সঙ্গীকে দেয় দুয়ো;
আধখানি গান নেমে চলে হাঁটা পথে।

পথের পাথর ভেঙে তুলি অবিনীত,

চাড় দিতে চাই হিরণ-পাত্রটিতে —
আর বিদ্যুতে রাত্রি বিচ্ছুরিত,
শিলাবৃষ্টিতে হি হি কেঁপে উঠি শীতে।

— এই তবে সেই হিরণ্যগর্ভ কী :
নিধান-কলসে আঁধার মুদ্রা নামে।
আধখানা গানে আমি খুব ভুল বকি,
অর্ধেক ঠিক তোমাদের সম্মানে।[১৮] ('এই গান' , 'নতুন কবিতা')

এ কবিতায় হিরণ্যগর্ভ একটি প্রাচীন মিথ। 'মৎস্যপুরাণ'এ হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ আছে। 'হিরণ্যগর্ভ' নামে অভিষেকের একটি অনুষ্ঠানের কথা বলা আছে মৎস্যপুরাণে। সেখানে আছে : একটি বড় সোনার পাত্রে নতুন রাজা প্রবেশ করতেন। তখন গর্ভবতী নারীর প্রসঙ্গে জন্ম-মন্ত্র উচ্চারণ করা হত। রাজা জন্মমন্ত্রে সে পাত্র থেকে বেরিয়ে আসতেন। 'উপনিষদ'এ হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ আছে। হিরণ্যগর্ভ কলসের প্রতীক। মহাভারতে কলস হয়েছে মাতৃগর্ভের প্রতীক। পরে কলস হয়ে উঠেছে মঙ্গলঘট। কলস আধার। তা যা কিছু ধারণ করতে পারে। তাই একইসঙ্গে কলস হয়েছে গৃহস্থ সংসারের প্রতিদিনের জলাধার।

ভারতীয় চেতনায় মাতৃতন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কলসের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন কবি। ভারতীয় জীবনে কলসের সঙ্গে মিশে আছে জন্ম, মৃত্যু, নিষেক ও অভিষেক। ভারতীয় শিল্পী যাঁরা তাঁরা কলসের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনকে পূর্ণরূপে। আর্য-পূর্ব সময় থেকেই কলস মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের আর অস্থায়ী প্রেরণার ভিত হয়ে ওঠে। কবি হিরণ্যগর্ভ অভিষেক অনুষ্ঠানের পুরাণ কথার নতুন নির্মাণ করেন 'নিধান-কলসের' মধ্য দিয়ে। পুরাণ কথা থেকে ভারতীয় জীবনে, ভারতীয় চেতনায় কবিতাটিকে নতুনভাবে প্রতিস্থাপিত করলেন কবি।

'অন্যযুগের সখা'র 'আবার হাসির মধ্যে' কবিতায় উল্লিখিত নৃসিংহমূর্তি স্মরণ করিয়ে দেয় পুরাণ প্রসঙ্গের:

'আবার হাসির মধ্যে খুলে গেল রাত্রি ফুল ভাস্বর শূণ্যতা:
বিশাল প্রান্তর ভরে ছুটে গেল জন্তু মুখ গুচ্ছের উন্মূল
ফলরাশি, হাস্য করো যে মুখ বেদনাবিদ্ধ দন্তের বিস্তারে,

চুম্বন গ্রন্থিতে জাগো স্মৃতিময় আননের রমণ দেবতা;

মুখোশ নৃসিংহমূর্তি কাঠের উৎকীর্ণ শিল্প মাঠের মাঝখানে।

বৃক্ষের আঁধার জানু ফেঁড়ে ফেলে খলখল সবুজ দীর্ঘিকা

এসো আলিঙ্গনে এসো দুপাশের লোলপথ, কালো-ঝরণারাশি

ঢাকো মুখ অশ্রুপাত হাড় হাতে ডুবে মরো নীলাভ শূণ্যতা।[১৯] ('আবার হাসির মধ্যে' , 'অন্যযুগের সখা')

এখানে নৃসিংহমূর্তি একটি মিথ। নৃসিংহ মূর্তির উল্লেখ আছে ভারতীয় পুরাণে। কবিতাটিতে আছে আফ্রিকার মুখোশ নৃত্যের স্মৃতি। ভারতীয় পুরাণের নৃসিংহ অবতার মূর্তিটি[২০] কাঠের তৈরি। এই মূর্তি পুরুষের কথা স্মরণ করায়। মাঠের মাঝখানে এই মূর্তি।

'দীর্ঘিকা' হল দীঘি। সবুজ দীর্ঘিকা নারীর কথা স্মরণ করায়। যাইহোক এ কবিতায় এসেছে গাছের বিষয়টি। গাছ কেটে পাওয়া যায় কাঠ। শিল্পী কাঠ থেকে তৈরি করেন বিভিন্ন শিল্প। গাছ থেকে কাঠ, কাঠ থেকে তৈরি শিল্পের প্রসঙ্গ চর্যাপদেও আছে। চর্যাপদে কবিগণ 'কায়াতরু'র কথা বলেন। চর্যাগানের আর্কিটাইপ বা আদিরূপ এই তরু। সেখানে গাছ থেকে তৈরী হয়েছে নৌকো, গোল, কুঠার ইত্যাদি।

এই কবিতাতেও নৃসিংহ মিথের সঙ্গে মিলেগেছে আদিরূপ গাছ। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর গড়ে উঠেছে নতুন জগৎ। একইভাবে গাছ কেটে হয়েছে কাঠ। কাঠ থেকে হয়েছে শিল্প। গাছ ফেঁড়ে কাঠ বের করে সৃষ্টি হয়েছে নৃসিংহমূর্তির মুখোশ। মুখোশ শিল্প। মানুষ তার প্রয়োজনে এ শিল্প রচনা করেছে। গাছ ফেঁড়ে গাছকে হত্যা করার মধ্যে ভেসে উঠেছে হিরণ্যকশিপুর ছবি। পুরাণ কথা এগিয়ে গেছে লোকায়ত হত্যা, লোকায়ত শিল্পের দিকে।

তার মনে আছে শ্যাওলা-পেছল ঘাট...

পা খশে পড়ল একবার ডুবজলে :

শর্ষের ফুল দেখতে দেখতে মনে হল তার হঠাৎ...

একে তো সকলে বউ-ডোবা দিঘি বলে।

অথচ কলসি নিয়ে কত সে সাঁতার

দিয়েছে এবং দম নেই, বুক ভ'রে

কতো যে ভেবেছে: শেষ করা যেত এই সব পারাপার...

কুয়োয় নামত কলসি ও দড়ি ধরে।[২১] ('ডুব' , 'দ্বিরাগমন')

'দ্বিরাগমন' এর 'ডুব' কবিতাটিতে 'বউ-ডোবা দিঘি' একটি প্রত্নপ্রতিমা। দিঘির ঘাট-শ্যাওলাতে ভর্তি। ফলে ঘাট হয় পিচ্ছিল। দিঘির শ্যাওলা পেছল ঘাট থেকে পা খসে পড়ে যায় কোনো গ্রামের বধূ। সর্ষের ফুল দেখতে দেখতে তার হঠাৎ মনে পড়ে এই দিঘিকে বলে 'বউ ডোবা দিঘি'। একসময় আমাদের গ্রামদেশে 'বউ-ডোবা দিঘির' প্রচলন খুব ছিল। স্বামী-শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেক জায়গায় বধূরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিত। গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে বা দিঘিতে ডুবে মরার চেষ্টা করত। তার থেকে দিঘির নাম হয় 'বউ-ডোবা দিঘি'। এর থেকে সৃষ্টি হয় অনেক লোককথা। কোথাও কোথাও এখনো এ দিঘি আছে। বর্তমান সময়েও বধূরা এ পন্থা অবলম্বন করে।

কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে দেখি বধূটির হঠাৎ মনে পড়ে যায় নির্যাতীত, অত্যাচারীত জীবনের কথা:

'... দম নেই, বুক ভ'রে

কতো যে ভেবেছে। ...'

বহুবার জলে ডুবে আত্মহত্যা করার চেষ্টার কথাও মনে পড়েছে:

'অথচ কলসি নিয়ে কত সে সাঁতার

দিয়েছে...'

শেষ পর্যন্ত তার ভাবনায় এসেছে কলসি ও দড়ি ধরে কুয়োয় নামতে পারলেই পৌঁছে যাবে জীবন ছাড়িয়ে মৃত্যুর পারে। কবিতাটিতে 'বউ ডোবা দিঘি'র প্রত্নপ্রতিমা বধূটির অসমাপ্ত জীবনের কথা তুলে ধরে। একইভাবে বধূটির অসমাপ্ত জীবনের মত বিশ্বজগতের বহু সৃষ্টি এরকম অসমাপ্ত থেকে যায়। এই প্রত্নপ্রতিমা মানুষীর অসমাপ্ত জীবন, কবির বা বিশ্বের অসমাপ্ত সৃষ্টিগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'অন্যযুগের সখা'র 'তরুণী' কবিতাতেও পুরাণ প্রসঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়:

নগণ্য এক তারার মতন তরুণী

উঠে এসেছিল, অন্য যুবক মুখে

এক পৃথিবীর সন্ধ্যার মত ছায়া

মেখে নিল তার নতশিরে, তার বুকে।

খুলে রেখেছিল সকল শরীর তার :

এসো, তুমি জল, একক আলোর ধারা;

পিপাসু শেকড় নানাদিকে চায়, দেখে

উঠে গেল আরও, সে মেয়ে, সন্ধ্যাতারা।

শেকড়ের নীচে যক্ষের বাড়ি ছিল :

গ্রামীণ কবিরা সারাদিন লোকগাথা

গেয়ে ঘরে গেল : কে তুমি গোপন আলো

লুকোনো রত্ন ... ও যুবক জানে না তা।[২২] ('তরুণী' , 'অন্যযুগের সখা')

কবিতার শেষ স্তবকে আছে যক্ষের কথা। যক্ষের কাহিনীই মিথ। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে আছে বিরহী যক্ষের প্রসঙ্গ। যক্ষের প্রসঙ্গ আছে লোকগাথায়। লোকায়ত যক্ষের গল্প থেকেই কবি কালিদাস সৃষ্টি করেন মেঘদূত কাব্যের বিরহী যক্ষকে। যক্ষ ধনী। যক্ষ কৃপণ। মাটির নীচে সারা জীবনের সঞ্চিত ধন রেখে সে মারা যায়। মারা যাওয়ার পর যক্ষ হয়ে সে সব পাহারা দেয়। এই কবিতায় মাটির নীচে লুকোনো রত্ন, শেকড় প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই নিহিত যক্ষের প্রসঙ্গ।

কবি তাঁর কবিতায় যক্ষের মিথকে গ্রহণ করেছেন, তার নতুন রূপ দিয়েছেন। তাঁর মতে আমাদের সাহিত্যে, আমাদের শিল্পে মিথ হল 'গোপন আলো', 'লুকানো রত্ন', 'পিপাসু শেকড়'। আজকের যুবক যারা তারা এর কিছুই জানে না। তারা জানে না লোকায়ত 'জক'ই কালিদাসের 'যক্ষ'। লোকায়ত শিল্প 'জক'ই, যে বহু অনুশীলনের পর 'সংস্কৃত শিল্প' যক্ষে পরিণত হয়েছে একথা সকলের কাছে কবি জানিয়ে দিয়েছেন কবিতায় যক্ষের প্রসঙ্গ এনে।

'অন্তর্জলি'র রথের মেলার ফুলওয়ালা রাধারানীও' আর্কিটাইপ বা প্রত্নপ্রতিমা :

'আমাকে কী স্বপ্নে দ্যাখো...। স্বপ্নে, একা ব'সে

দুঃখিনীর মতো গলা (কণ্ঠায় তো হার নেই) এই বলে তুমি

চেয়ে ছিলে কিছুক্ষণ। আমিও যে জেগে উঠতে চাই —
ঘুমন্ত শব্দের দিকে সোনালি বালির মত অল্প উড়ে যেতে।
বাবলার ছায়া ধূ-ধূ কথা বলে নদীর ওপারে: ...আর
এই হল ছেলেদের প্রবণতা, জেগে উঠবে, মনে হবে যেন বেশিক্ষণ
এখনও জাগে নি।

রাধারানী তোকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।
রথের রশির টান অর্ধেক না হতে এল বৃষ্টি, ঝড়। চুলে
তোর যে ফুলের মালা শোভা পেত, আমি সব বহুমানে কিনে
নিতে চাইলে বেলা হলো, ততক্ষণে ভাঙা মেলা, চুপড়ির আলতা-সিঁদুর
হলুদ মাখানো গার তেলরঙ ছিঁড়ে পড়ে আছে। ছেলেবেলা পড়া
'কিশলয়' বইটির প্রেমে এই পড়া গেল, প্রৌঢ়তার ভান
ছত্রখান, তবু তাকে এভাবেই বলি।
বালিশ তো ভিজে গেছে, তুমিই বলতে না
মানুষের যত বেশি কথা আছে, তার চেয়ে বড়ো ফোঁটা ফোঁটা
অশ্রুর সঞ্চয় নেই কেন। বালিশ শেলাই করে রাখা গুপ্তধন —
আমিও কেমন হেসে বলতে গিয়ে মনে পড়ল... কিরকম, আজ কি রকম।
সমস্ত দিনই গেল হাঁটু গেড়ে, ধাক্কা মেরে, চিৎ ক'রে ফেলে
পাশব হিংস্রতা নিয়ে বুকে ঝুঁকে পড়তেই মুখের ওপর
চোখের ওপরে ছায়া প্রার্থনা উপোসি নামলো; ঘুম ভেঙে উঠে
(পিনকুশনের মতো ভোঁতা ভারি মুখে গেঁথে কৌশলী বেদনা)
স্বপ্ন-দিনলিপি লিখি: কাঁসাই নদীর কাদা মেয়েটির চুলে
লেগেছিল, তা জানে না মেদিনীপুরের লোকজন।"[২৩]

('অর্ন্তজলি' , 'অগ্রন্থিত কবিতা')

'অন্তর্জলি' কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধারানী' উপন্যাসের রাধারানীর প্রন্নপ্রতিমা চিত্রিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে আছে রাধারানী অবস্থাপন্ন বাড়ীর মেয়ে হয়েও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব হারিয়ে গরীব হয়ে পড়ে। রুগ্না মা ও মেয়ের সংসার। অসুস্থ মায়ের পথ্য

জোগাড় করার উদ্দেশ্য নিয়ে রাধারানী মাহেশের রথের মেলায় যায় বনফুলের মালা বিক্রি করার জন্য। কিন্তু রথের রশির টান অর্ধেক না হতেই ঝড়, বৃষ্টি আসে। দুঃখকষ্টের অবসান বোধ হয় রাধারানীর ভাগ্যে ছিল না। বনফুলের মালা তার আর বিক্রি হল না। পরে এক পথিকের সহায়তায় (রুক্মিনীকুমার রায়) রাধারানীর সমস্যার সমাধান ঘটে। বহুমানে কিনে নেয় তার বনফুলের মালা।

কবির কবিতায় মেলা'র কথা বারবার এসেছে। মেলাতে সকলে এসে মেলে এবং নিজেকে মেলে ধরে। তবে মেলার কোলাহলে নিজেদের মিলিয়ে দিলেও তাদের ভেতরে থাকে একটা যন্ত্রণা। 'অন্তর্জলি' কবিতার কথকের মধ্যেও আছে কোনো এক রাধারানীকে হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা। তার রাধারানীর চুলে যে মালা শোভা পেত মেলায় তা বহুমানে কিনে নিতে চাইলে তখন সময় শেষ হয়ে যায়। ঝড় বৃষ্টিতে ভেঙে যায় মেলা। ছিঁড়ে পড়ে যায় চুপড়ির আলতা, সিঁদুর, হলুদ মাখানো গায়ের রং। রাধারানীর আর কিছুই পাওয়া হয় না।

মানবজীবনেও দেখা যায় রাধারানীর মতো একাদশ বর্ষীয় বালিকাদের চুলে ফুলের মালা শোভা পায় না অভাবের তাড়নায়। সারাদিনের পরিশ্রমের গাঁথা মালা ব্যবহৃত হয় অন্যান্য কাজে। রাধারানীর মতো সহজ, সরল, নির্লোভ মনের মেয়েদের দুঃখ কষ্ট বিরহ যন্ত্রণাই প্রাপ্য। বলা যায় রাধারানী এখানে চিরন্তন বিরহের প্রন্নপ্রতিমা।

'নতুন কবিতা'র 'শকুন্তলা' কবিতাতেও মিথ এর ব্যবহার করেন :

আকাশের থেকে মাটিতে এসেছি নেমে।
দিন আর রাত ঝাঁপিডানা এক পাখি —
তার আগলানো পাখা থেকে সরে ক্রমে
বুকের খাঁচায় ঝাপটানো ছিল বাকি;
আর বাকি ছিল পথ চলা, কথা বলা,
জল সেচ করা... খালি কাজ ওঠে জমে;
ফাঁকা হয়ে যায়। কে যে ফের ডাকাডাকি
শুরু করে দিল : ওলো ও শকুন্তলা।

এই আসছি আমি। ভেসেছি বানের জলে।

হাল ছেড়ে আজ ফিরে গেছে আশ্রমে
সখী পিসি লতা হরিণ শিষ্য ঋষি।
ফেরা নেই, শুনি নর্তকী ওরা বলে
নতুন ফুলের মধু খোঁজে মৌমাছি।
আজকের রানি কালকের নটী, ফলে
জানি না আগামীকাল যে কি হবো আমি —
যদি-র সেকথা নদীতে ভাসাতে রাজি

তুমি শুধু বলো : রয়েছি জেলের ছেলে।
জলে ঝাঁপ দিয়ে, জালটি গুটিয়ে এনে
দেখেছি বোয়াল পেট কেটে — মেশামেশি
শামুক শ্যাওলা আর এই যে আংটি —
এই নাও এটি আমার অভিজ্ঞান।
যেন মালিনীর সেই ছায়া ছলছলে
জলে নেমে গেছি — এমনি প্রেমের গান
এসো গাওয়া হোক নান্দী সদলবলে।

করুক পুলিশ মেরে ধরে কুটিকুটি।[২৪] ('শকুন্তলা' , 'নতুন কবিতা')

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্ক, 'প্রবেশক' প্রসঙ্গের নবনির্মিতরূপ কবির 'শকুন্তলা' কবিতায় লক্ষ্যনীয়। কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' কাহিনী রচনা করেন মহাভারতের আদিপর্বের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যান অবলম্বন করে। হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্মন্ত ও মহর্ষি কন্বের কন্যা শকুন্তলার বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনীকে কালিদাস এগিয়ে নিয়ে গেছেন 'অদ্ভুত কৌশলে'। কাহিনীতে সমাবেশ ঘটিয়েছেন অলৌকিক 'চমৎকারিত্বের'। দেবলোক থেকে নরলোক, সর্গ থেকে নিসর্গ সব কিছু নিয়ে এই নাটকের প্রসার। 'স্বর্গের সুরসভা' থেকে 'মর্ত্যের মালিনীতীর' পর্যন্ত এই নাটক স্বর্গ মর্ত্যব্যাপি ছড়িয়ে আছে। ষষ্ঠ অঙ্ক, 'প্রবেশক'-এ আছে সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার চিত্র। গৌতমীর শচীতীর্থের জলে আংটি পড়ে যাওয়ার সত্য অনুমান, ধীবর বৃত্তান্ত, পুলিশের ঘুষ

নেওয়ার চিত্র, চোর অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের রীতি প্রভৃতির বর্ণনা ষষ্ঠ অঙ্কে উপস্থিত। এ বর্ণনারই নবমূল্যায়ণ করেছেন কবি বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর 'শকুন্তলা' কবিতায়। শকুন্তলা একটা মিথ।

'আকাশের থেকে মাটিতে এসেছি নেমে।

অপ্সরা মেনকার গর্ভজাতা শকুন্তলা। মেনকা রাজর্ষি কৌশিকের তপস্যাভঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর রোষানলে পড়ে। তারপর মেনকার হৃদয় উন্মাদকরূপ দেখে মনোরম বসন্ত সময়ে রাজর্ষি মেনকার সঙ্গে মিলিত হন এবং জন্ম নেয় শকুন্তলা, সদ্য জন্মানো কন্যাকে শকুন্তলার জননী বনানীর কোলে সমর্পণ করে এবং অন্তর্হিত হয়। পরিত্যক্ত শকুন্তলাকে লালিত পালিত করেন মুনি কাশ্যপ তাঁর আশ্রমে। এইভাবে শকুন্তলার মর্ত্যে অবতরণ।

দিনরাত ঢাকনাযুক্ত তালপাতা বা বেতের পেটিকাতে সুরক্ষিত থাকা এক পাখি 'তার আগলানো পাখা থেকে ক্রমে সরে আসে। বুকের পাঁজরায় ধাক্কা মারে। ঋষির আশ্রমে পরিত্যক্ত শকুন্তলা সুরক্ষিত থাকত এক ঝাঁপির মধ্যে। তারপর বেরিয়ে আসে সেখান থেকে। শকুন্ত কথার অর্থ পাখি। আশ্রম বালিকা শকুন্তলা পরিণত হয় আশ্রম কন্যাতে। সাধারণ পরিবারের মতো ঋষির আশ্রমেও বসন্ত আসে। ঋষি কন্যার হৃদয়েও পূর্বরাগের বন্যা বয়। দুষ্মন্তকে দেখার পর দুষ্মন্তের সান্নিধ্যে এসে শকুন্তলার হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়। বাকি ছিল শকুন্তলার হৃদয়ে মিলনের ছায়াময়ী মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা। রাজ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকা অনেক অনেক সুন্দরী থাকলেও দুষ্মন্তের হৃদয়ে রেখাপাত করতে পেরেছিল শকুন্তলাই। রাজা দুষ্মন্তও উপলব্ধি করেছিলেন বনকন্যা শকুন্তলার আকর্ষণ। আশ্রমকন্যা শকুন্তলাকে আশ্রমের সকলের মতই স্বাভাবিক কাজ করতে হত। বনজোৎস্নার মূলে জল দেওয়া, কতকথা বলা, কতপথ চলা ইত্যাদি নানারকম জমে ওঠা কাজ। একসময় সব কাজ শেষে হলে সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদার ডাক পড়ে :

'ওলো ও শকুন্তলা'। সেই ডাকে সাড়া দিতে হয় শকুন্তলাকে। কেননা 'ওলো' সম্বোধন পদের মধ্যেই শকুন্তলা উপলব্ধি করতে পারত তাদের ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতা।

পিতার আশ্রম ছেড়ে পতিগৃহে আসে শকুন্তলা। কিন্তু পরিণয়ের পরিচয়ের সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে দুষ্মন্ত শেষপর্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করে। স্মৃতিচিহ্ন দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েও দেখাতে না পেরে আবার আশ্রম কন্যা আশ্রমেই ফিরে আসে। সেই মুহূর্তে তার মনে হয় খড়কুটোর মতো বন্যার জলে সে ভেসে গেছে। আশ্রমে ফিরে আবার মনকে সমর্পণ করে সখী

অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদার সাথে, পিসি গৌতমীর সাথে। জড়িয়ে পড়ে লতা, হরিণ, ঋষি, শিষ্যদের সাথে। দুষ্মন্তকে দেখার পর শকুন্তলার হৃদয়ে ভাবের উদয় হয়। এই ভাবের যথার্থ স্বরূপ সে বুঝতে পারে নি ঠিকই তবে এটুকু উপলব্ধি করেছিল যে ঐ ভাব যারা আশ্রমে তপোবনে বাস করে তাদের হৃদয়ের 'বিরুদ্ধ'। এ জ্ঞানের উদয় হওয়ার পরেও নিজেকে জগতের আড়ালে রাখে। তবুও বানের জলে ভাসতে হয়েছিল শকুন্তলাকে। সব হারাতে হয়েছিল তাকে, ফেরার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে না পেরে নর্তকী, অভিনেত্রী বলেছেন। আজ রানি শকুন্তলা যদি নর্তকী শকুন্তলাতে পরিণত হয় তাহলে আগামীদিন শকুন্তলার পরিচয় কি হবে তা সে জানে না। তাই 'যদি' এই সংযোজক অব্যয়ের সঙ্গে সমস্ত চিন্তাভাবনা নদীতে ভেসে যাবে।

মৌমাছির কাজ নিত্য নতুন ফুলের মধু খোঁজা। দুষ্মন্তও তাই করেছেন। তবে তাঁর মধু খোঁজা সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

জেলে জল থেকে জাল গুটিয়ে এনে বোয়াল মাছের পেট কেটে স্মৃতিচিহ্নরূপে পায় একটি আংটি। তা শামুক, শ্যাওলা মেশামিশি। মালিনী অর্থাৎ যে মালা গাঁথে তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করার কথা বলেছেন কবি। আবার মালিনী নদীর ছায়া ছল্‌ছল্‌ জলে নেমে গেছে। প্রেমের গান গাইছে সমবেতভাবে। 'নান্দী' কথার অর্থ হল নাটকাদির শুরুতে মঙ্গল আচরণ করা। নান্দী শব্দটি আসছে 'নন্দন' কথা থেকে। নন্দন কথার অর্থ হল আনন্দ। যে কোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে এই মঙ্গল আচরণ করা হয়। নাটকাদির শুরুতে কর্তব্য দেবাদির স্তুতি বা বন্দনাই নান্দী। জল আর জীবন, প্রেম, ভালোবাসার গান গায়। এবার সেখানে পুলিশ মারুক, ধরুক, কেটে কুটিকুটি করুক তাতে কিছু ক্ষতি নেই।

কবি কবিতাটির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন মানব জীবনের নর-নারীর প্রেমের অবস্থা, তৎকালীন সমাজের থেকেও বর্তমান সমাজের দুর্বিষহ পরিস্থিতির কথা। তবুও বেঁচে থাকবে মানব-মানবীর প্রেম, বেঁচে থাকবে প্রেমের গান গাওয়া।

কবিতাটি দুই মেরুতে যাতায়াত করছে – অতীত এবং বর্তমান। অর্থাৎ কবিতাটি সচল, স্থির নয়। কালিদাসের জেলে রোহিত বা রুই মাছ কেটে পেয়েছিল যে আংটি সে আংটিতে ছিল কেবলমাত্র কাঁচামাংসের গন্ধ। এ কবিতায় রুই নেই, তার জায়গায় এসেছে বোয়াল। বোয়াল মাছের পেট কেটে পাওয়া গেছে শামুক, শ্যাওলা আর আংটি। যদি কোনো পুকুরে বোয়াল

থাকে তাহলে আর অন্য মাছ বাঁচতে পারে না। একে বলে মাৎস্যন্যায়। আজকের দিনেও মাৎস্যন্যায়ের কাল। এই মাৎস্যন্যায়ের কালে আমরা প্রতিবাদহীন শম্বুক বা শামুক। যে শামুক সামান্য আঘাতেই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। বোয়ালের পেটের মধ্যে পাওয়া গেছে শ্যাওলাও। যে শ্যাওলা সাধারণ মানুষগুলোকে জড়িয়ে থাকে। এরা নিম্নবর্গীয় মানুষ। দিন আনে দিন খায়। শামুকের মতো বেঁচে থাকে, এগুতে পারে না। শ্যাওলা পিছল,প্রতি মুহূর্তে এরা পড়ে যায়। কালিদাসের আংটি এ কবিতায় ব্যবহৃত কিন্তু এ আংটি আংটাস্বরূপ। আংটা ধরে তুললে বেরিয়ে আসবে তাদের অন্ধকার জীবনের স্বরূপ। সে স্বরূপ হল ডানা ঝাপটানো, জলসেচ করা, কথা বলা, পথ চলা, জমে থাকা কাজ সারা, বানের জলে ভেসে যাওয়া কিম্বা ফিরে আসা। কালিদাসের মালিনী নদী এখানে ছায়া ছলছলে হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো এ ছায়া কোনো নারীর ছায়া যার নাম মালিনী, যে জেলের ছেলের প্রেমিকা। অথবা যদি নদীও ভাবি জেলের ছেলের কাছে নদীই জীবন। জীবন বাঁচাতে গিয়ে তাদেরকে মাছ ধরতে হয়। নদীতে মাছ ধরলে এখন পুলিশ ধরে না। কিন্তু একদা নবাব-বাদশা বা ইংরেজ সরকার নদীগুলোকে জমিদারদের লিজ দিয়ে দিত। তখন সে জলে নামতে গেলেই পুলিশ ধরত। তাহলে মানুষের বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। পুলিশ ধরুক, মারুক, কুটিকুটি করুক, এটাই নিম্নবর্গীয় মানুষের ফিরে আসার গল্প। এবং এই গল্প নান্দীরা গেয়ে উঠুক নাটকের শুরুতে। এখান থেকে হয়তো কোনো পথ পাওয়া যেতে পারে।

‘জানি না আগামীকাল যে কি হব আমি —

যদির সে কথা নদীতে ভাসাতে রাজি।’

‘যদির সে কথা নদীতে ভেসে যাক’ এটা আমাদের বাংলা প্রবাদ। এ কবিতায় নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। আগামীকাল অন্য কিছু ঘটতেও পারে।

কবি কবিতায় পুরাণ প্রতিমা ব্যবহার করেন আধুনিক সময়ের কোনো বক্তব্যকে বোঝানোর জন্য। আর পুরাণ প্রতিমার সার্থক ব্যবহার করতে পারেন কেবলমাত্র একজন নির্মাণকুশলী কবিই। উত্তরাধিকার সূত্রে পরম্পরা অনুযায়ী এ কাজ আমাদের সাহিত্যে বাঙালী কবিরা করে চলেছেন।

তথ্যসূত্র

১। পারিভাষিক সংজ্ঞা অনুসারে আর্কিটাইপ হল 'The Original Pattern or model of all things of the same type' (from which copies are made; therefore a prototype.) সাহিত্যশাস্ত্রে আর্কিটাইপ 'পারিভাষিক অর্থে হল এক ধরনের প্রতীক, সাধারণত তা বাক্‌প্রতিমাই, যা সামূহিক সারস্বত মৌল ব্যপার বলে সাহিত্যে পুনরাবৃত্ত ব্যবহার পায়।'

মানবজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা বা পর্বগুলি সবই আর্কিটাইপাল, যেমন: জন্ম, বিকাশ, প্রেম, পারিবারিক জীবন, জ্বরা, মৃত্যু ইত্যাদি। দর্শন সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে, ঋগ্বেদে ও অর্থববেদে, চর্যাগানে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় আর ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে আর্কিটাইপের ছড়াছড়ি। বেদে বাণী ও বীণা, অগ্নি ও ঊষা, যম-যমী, প্রজাপতি বা গঙ্গা; চর্যাগানে হাঁস ও হরিণ, বৃক্ষ কুঠার ও বৃক্ষবদ্ধ কুঠার, ধনুক ও বাণ, চোর বা ভিক্ষু; রবীন্দ্রনাথের রচনায় দ্বার ও দীপ, সাঁকো ও নৌকো, সূর্য আলো : ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে উমা, সীতা, কালী — প্রভৃতি সবই আর্কিটাইপের উদাহরণ।

ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), 'পরিভাষাকোষ, সিনেমা ও অন্যান্য দৃশ্যশিল্পমাধ্যম', সুজন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬২-৬৩।

২। বীতশোক ভট্টাচার্য , 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান', বাণীশিল্প, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ. ৭৮-৭৯।

৩। তদেব,পৃ. ৭৮-৭৯।

৪। প্রভাত মিশ্র, 'কবি বীতশোক', সৃজন, কলকাতা, পৃ. ১৩।

৫। শঙ্কর বসু মল্লিক ও গৌরী ভট্টাচার্য্য, 'পুরাকথার স্বরূপ', বেস্টবুক্‌স, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৩-৩৪।

৬। Frieda Fordham : 'An Introduction to Jung's Psychology', Penguin Books, England, 1953, P. 50-51.

৭। নরেশ গুহ (সম্পাদিত) বুদ্ধদেব বসুর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'দ্রৌপদীর শাড়ি', দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ, কলকাতা,১৯৬০, পৃ. ৮০।

৮। ‘একদিন ভোরবেলা’ কবিতাটি প্রকাশিত হয় ‘অন্যযুগের সখা’ গ্রন্থে ১৯৯১ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’য়।

বীতশোক ভট্টাচার্য, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৯।

৯। কবির ‘শেষের কবিতা’ কবিতাটি প্রকাশিত হয় ‘জলের তিলক’ গ্রন্থে ২০০৩ সালে।

বীতশোক ভট্টাচার্য, ‘জলের তিলক’, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪১।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,‘অচলিত খণ্ড’ ।

১১। বীতশোক ভট্টাচার্য, ‘অন্যযুগের সখা’, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ২১।

১২। বীতশোক ভট্টাচার্য, ‘নতুন কবিতা’, তাম্রলিপ্ত, তমলুক, ১৯৯২, পৃ. ২৮।

১৩। তুলসীদাস সুবিখ্যাত হিন্দী কবি ও পরম ভক্ত সাধু। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করে সংসারী হন। পত্নীপ্রেমে এতদূর মুগ্ধ ছিলেন যে একদণ্ডও তাঁকে না দেখে থাকতে পারতেন না। শেষপর্যন্ত পত্নীর ভৎর্সনায় ঈশ্বর অন্বেষণে বের হন এবং সাধন-ভজন দ্বারা ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হন।

তুলসীদাস হিন্দী ভাষায় রামচরিত প্রণয়ন করেন। যা ‘তুলসী রামায়ণ’ নামে খ্যাত। এই রামায়ণ বেদশাস্ত্রের মত হিন্দুস্থানবাসীর প্রতি গৃহে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পঠিত ও সম্মানিত হয়। এই রামায়ণ পাঠে অতি কঠিন হৃদয়ও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। তাঁর নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক দোঁহাবলী অনেকের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ করেছে।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দত্ত (সম্পাদিত), ‘সরল বাংলা অভিধান’, নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা, ১৩২৩, পৃ. ৫০৬।

১৪। ‘পদাবলী’ কবিতাটি প্রকাশিত হয় ‘দ্বিরাগমন’ গ্রন্থে ১৯৯৭ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় কবির ‘কবিতা-সংগ্রহ’এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য, ‘কবিতা সংগ্রহ’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১০৬।

১৫। অমিতাভ গুপ্ত, ‘মাতা ও মৃত্তিকা’, অন্যধারা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৬২।

১৬। কালীকৃষ্ণ গুহ, ‘অপার যে বিস্মরণ’/‘রাস্তাঘাট’।

১৭। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'অন্যযুগের সখা', প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৬১।

১৮। 'এই গান' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'নতুন কবিতা' গ্রন্থে ১৯৯২ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৬৩।

১৯। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'অন্যযুগের সখা', প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৩৩।

২০। নৃসিংহ অবতার বিষ্ণুব চতুর্থ অবতার। নর অথচ সিংহ এই অবতারে হিরণ্যকশিপু বধ হয়। ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হয়ে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নানারকম উপদ্রব আরম্ভ করে এবং দেবগণেরও অবাধ্য হওয়ায় ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী হয়ে ওঠে। এমন কি নিজ পুত্র প্রহ্লাদকে হরিভক্ত জানতে পেরে তার প্রাণ বিনাশের জন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃত হরিভক্তের বিনাশ নেই। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের জীবন শেষ করতে না পেরে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন তার হরি সভাস্থ স্ফটিকস্তম্ভে আছেন কি না। প্রহ্লাদ আছেন বলতে হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে স্তম্ভ ভেঙে ফেলেন, সেই মুহূর্তে স্তম্ভের মধ্য থেকে বিষ্ণু অর্দ্ধসিংহ ও অর্দ্ধনরের মূর্ত্তিতে বের হয়ে দৈত্যরাজের প্রাণবধ করেন।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দত্ত (সম্পাদিত), 'সরল বাংলা অভিধান', নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা, ১৩২৩, পৃ. ৫৯০।

২১। 'ডুব' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'দ্বিরাগমন' গ্রন্থে ১৯৯৭ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', 'এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১১২।

২২। বীতশোক ভট্টাচার্য , 'অন্যযুগের সখা', প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৯১, পৃ. ২৯।

২৩। ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত 'অগ্রন্থিত কবিতায়' 'অন্তর্জলি' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পরে কবিতাটি স্থান নেয় 'কবিতা সংগ্রহ'-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', 'এবং মুশায়েরা', কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৮৭।

২৪। 'শকুন্তলা' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'নতুন কবিতা' গ্রন্থে ১৯৯২ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ' গ্রন্থে।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৪৮।